

ফিলিস্তিনের চিঠি

ঘাসান কানাফানি; অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্পটির মূলভাব

এটি পত্রের ভাষায় রচিত একটি অনুবাদমূলক গল্প। এতে ইসরায়েলের আক্রমণে বিপর্যস্ত ফিলিস্তিনের মর্যাদিক চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। বন্ধু মুস্তাফাকে সম্বোধন করে লেখা এই চিঠিতে দেখা যায়, যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিনকে ছেড়ে সুন্দর ও সুখী জীবনের প্রত্যাশায় মুস্তাফা প্রথমে কুয়েত ও পরে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যায়। চিঠির লেখককেও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমন্ত্রণ জানায় মুস্তাফা। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর বিপন্ন ফিলিস্তিন ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন পত্রলেখক। কিন্তু করুণ এক অভিজ্ঞতা তাকে আমূল বদলে দেয়। সে ফিলিস্তিন ছাড়ার পূর্বে নিজের মা-ভাবির সঙ্গে দেখা করতে এসে জানতে পারে, তার নিহত ভাইয়ের মেয়ে নাদিয়া বোমার আক্রমণে আহত হয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। লেখক তাকে দেখতে যায়। নাদিয়ার মনকে প্রফুল্ল করার জন্য বলে, তার চাওয়া অনেকগুলো লাল সালায়ার সে নিয়ে এসেছে। সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরলেই নাদিয়া সেগুলো দেখতে পাবে। একথা শুনে নাদিয়ার চোখ ভিজে যায়। সাদা চাদর তুলে দেখায়, তার দুই পা কেটে ফেলা হয়েছে। এই দৃশ্য লেখকের মনকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়। সে সিদ্ধান্ত নেয়, ফিলিস্তিন ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। বন্ধুকেও আহ্বান করে দেশে ফিরে আসার। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ ও সংকটাপন্ন স্বজনদের ফেলে রেখে স্বার্থপরের মতো অন্যদেশে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোনো মহত্ত্ব নেই। এই গল্পের ভেতর দিয়ে উঠে এসেছে, দেশ ও স্বজনের বিপদে পাশে দাঁড়ানোই মানুষের প্রকৃত দায়িত্ব।



গল্পটির শিখনফল : গল্পটি অনুশীলন করে আমি—

- শিখনফল-১ : বিপদের দিনে স্বজনের পাশে দাঁড়াতে শিখব।
- শিখনফল-২ : পরোপকারের গুরুত্ব বুঝতে পারব।
- শিখনফল-৩ : যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানতে পারব।

লেখক-পরিচিতি

নাম : ঘাসান কানাফানি।
জন্ম : ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান : আক্রা।
পেশা / কর্মজীবন : প্রথমে সিরিয়ার রাজধানী এবং পরে কুয়েতে শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা করেন।
সাহিত্য সাধনা : সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্র : আল-হাদাফ।
মৃত্যু : ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ।



অনুবাদক

নাম : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
জন্ম : ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান : সিলেট।
পুরস্কার/সম্মাননা : অনুবাদ সাহিত্যের জন্য তিনি ভারত সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন।



ব্যতিক্রম



অনুশীলন



মূল্যায়ন পদ্ধতির সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে
১০০% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন ও উত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, NCIB প্রদত্ত চূড়ান্ত নম্বর বটন অনুযায়ী অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় আনন্দপাঠ অংশ থেকে বর্ণনামূলক প্রশ্ন থাকবে। মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তরসমূহ নিচে সংযোজিত হলো। পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য প্রণোদনগুলো বুঝে প্র্যাকটিস কর।

গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর



বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০১

- ক. মুস্তাফার ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যাওয়ার কারণ কী? ৩
খ. “দেশ ও স্বজনের পাশে দাঁড়ানোই মানুষের প্রকৃত দায়িত্ব।”—
‘ফিলিস্তিনের চিঠি’ গল্প অবলম্বনে আলোচনা কর। ৭

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ‘ফিলিস্তিনের চিঠি’ গল্পে দেখা যায়, লেখক ও মুস্তাফা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারা একে অন্যকে কথা দেন যে, তারা সারা জীবন একসঙ্গে থাকবেন এবং অবশ্যই বড়লোক হবেন। একসময় তাদের অনেক টাকা হবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিন থেকে জীবনের উন্নতি করা সম্ভব নয়। সুন্দর ও সুখী জীবনের প্রত্যাশা করতে চাইলে ফিলিস্তিন ছেড়ে অন্যত্র পাড়ি জমাতে হবে। জীবনের লক্ষ্য পূরণের জন্য লেখকের বন্ধু মুস্তাফা একসময় পাড়ি জমান কুয়েতে। কুয়েতের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে গাজার যুদ্ধবিধ্বস্ত জীবন ছেড়ে কুয়েতে চলে যান তিনি। সেখান থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় যাওয়ার সুযোগ এলে সেখানে চলে যান মুস্তাফা। মূলত সুন্দর ও সুখী জীবনের প্রত্যাশায় মুস্তাফা ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যান।

খ. একজন প্রকৃত মানুষ সে-ই, যে নিজের স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে বৃহত্তর কল্যাণের জন্য কাজ করে। নিজের ক্ষুদ্রতম স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে দেশ ও স্বজনদের পাশে দাঁড়ানোর উদার মানসিকতার একজন মানুষ মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং দেশপ্রেমের ওপর জোর দেয়। ‘ফিলিস্তিনের চিঠি’ গল্পে লেখক মানুষের সেই প্রকৃত দায়িত্ব পালন করে উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

বন্ধু মুস্তাফাকে লেখা একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে ‘ফিলিস্তিনের চিঠি’ গল্পটি। এ গল্পের সেই চিঠির মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন লেখক ও তাঁর বন্ধু মুস্তাফা সম্পর্কে জানতে পারা যায়, তেমনি জানতে পারা যায় যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিন সম্পর্কে। গল্পের ভেতরে প্রবেশ করলে দেখা যায়, লেখক ও তাঁর বন্ধু মুস্তাফা সুন্দর ও সুখী জীবনের আশায় ফিলিস্তিন ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি জমাতে চান। এরই ধারাবাহিকতায় তারা কুয়েতের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকরি নিয়ে কুয়েতে বসবাস করতে থাকেন। সেখান থেকে মুস্তাফা ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যান এবং তার কিছুদিনের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে লেখককে নেওয়ার ব্যবস্থা করে তাঁকেও সেখানে ডেকে পাঠান। লেখক ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যাওয়ার জন্য গাজার আসেন তাঁর স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু নিজ দেশে এসে দেশের করুণ পরিস্থিতি দেখে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। গাজার বোমার আঘাতে আহত তার ভাইয়ের মেয়ে নাদিয়ার দুই পা উরুর কাছ থেকে কেটে নেওয়া হয়। দেশের এই করুণ পরিস্থিতিতে নিজেকে মুক্ত করে পালিয়ে যেতে বিবেকে বাধে লেখকের। তিনি দেশ

ও স্বজনদের চরম দুর্দিনে তাদের পাশে না দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি। দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে লেখক তাঁর সারা জীবনের স্বপ্নকে বিসর্জন দিয়েছেন।

তিনি আর সুখী ও সুন্দর জীবনের জন্য ক্যালিফোর্নিয়ায় যেতে চান না, বড়লোকও হতে চান না। বরং দুর্দিনে দেশ ও স্বজনদের পাশে থেকে তাদের সেবা করতে চান। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে দেশের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে চান। দেশপ্রেমের এই অনুভূতি থেকে লেখক তাঁর বন্ধু মুস্তাফাকেও ফিলিস্তিনে ফিরে আসার আহ্বান করেন। কারণ এটিই মানুষ হিসেবে প্রকৃত দায়িত্ব।

পরিশেষে বলা যায়, ‘ফিলিস্তিনের চিঠি’ গল্পে লেখক তাঁর উদার মানবিকতা থেকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ ও সংকটাপন্ন স্বজনদের ফেলে রেখে স্বার্থপরের মতো অন্য দেশে পালিয়ে যেতে পারেননি। বিপদের সময় দেশ ও স্বজনের পাশে দাঁড়িয়ে প্রকৃত মানুষের দায়িত্ব পালন করেছেন, যা তাঁর চরিত্রকে মহৎ করে তুলেছে।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০২

- ক. “আমি জানতাম কিছু একটা রহস্য আছে।”— এখানে কোন রহস্যের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
খ. লেখক তাঁর বন্ধু মুস্তাফাকে দেশে ফিরে আসতে বলেছেন কেন? বিশ্লেষণ কর। ৭

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ‘ফিলিস্তিনের চিঠি’ গল্পে দেখা যায়, লেখক ক্যালিফোর্নিয়ায় যাওয়ার জন্য কুয়েত থেকে গাজার এসেছেন তাঁর স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি বাড়িতে পৌঁছালে তাঁর ভাবি এসে তাঁকে জানান যে তাঁর ভাইয়ের মেয়ে তেরো বছরের নাদিয়া বোমার আক্রমণে আহত হয়ে গাজার হাসপাতালে আছে। কথা শুনে লেখকের বুঝতে বাকি থাকে না যে, এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে। লেখক এক পাউন্ড আপেল কিনে হাসপাতালে যান নাদিয়াকে দেখতে। নাদিয়ার মনকে প্রফুল্ল করার জন্য তিনি তার জন্য অনেক কিছু নিয়ে এসেছেন বলে জানান। নাদিয়া সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেই সেগুলো দেখতে পাবে। শুনে নাদিয়ার দুচোখ জলে ভিজে যায়। নাদিয়া গায়ের সাদা চাদর তুলে ফেললে দেখতে পান তার পা উরুর কাছ থেকে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। লেখককে জানানো হয় নাদিয়া আহত হয়েছে। অথচ পায়ের কথা কিছু বলা হয়নি। তিনি ভেবেছিলেন কিছু একটা রহস্য আছে। কিন্তু এত বড় দুঃসংবাদের কথা তিনি ভাবেননি।

খ. গাজার হাসপাতালে ভর্তি নাদিয়াকে দেখতে গিয়ে লেখক অনেক কিছুই অনুধাবন করেন। নাদিয়ার কাটা পা দেখে তাঁর মনে দেশ ও স্বজনদের জন্য কর্তব্যবোধ চলে আসে। তাদের সংকটকালে তিনি স্বার্থপরের মতো না পালিয়ে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে

উদার মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন। দেশ ও স্বজনদের জন্য তিনি দায়িত্ব নিতে চেয়েছেন। বন্ধু মুস্তাফাকেও তিনি দেশের সেবায় এগিয়ে আসতে বলেন। যার কারণে বন্ধু মুস্তাফাকে দেশে ফিরে আসতে বলেছেন। 'ফিলিস্তিনের চিঠি' গল্পে যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিনের চিত্র ফুটে উঠেছে। যেখানে দেখা যায়, ফিলিস্তিনের অন্যতম শহর গাজা বোমার আঘাতে জর্জরিত। সেই বোমার আঘাত এসে লেগেছে লেখকের পরিবারের মধ্যেও। তাঁর তেরো বছরের ভতিজি নাদিয়া বোমার আঘাতে দুটি পা হারিয়েছে। নাদিয়া ইচ্ছে করলে নিজের পা বাঁচাতে পারত কিন্তু সে নিজের কথা না ভেবে তার ছোট ভাইবোনদের রক্ষা করতে চেয়েছে। বোমা আর আগুনের হিংস্র থাবা থেকে সে তার ভাইবোনদের বাঁচিয়ে নিলেও নিজে বাঁচতে পারেনি; পা দুটো হারিয়েছে। নাদিয়ার দায়িত্ববোধ দেখে লেখকের মনেও দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়। তিনি নিজের সারা জীবনের স্বপ্নকে বিসর্জন দিয়ে দেশ ও সংকটাপন্ন স্বজনদের পাশে দাঁড়াতে চান। তিনি অন্য দেশে পালিয়ে সুখী জীবনযাপন না করে নিজ দেশকেই মুক্ত করতে চান। দেশের মানুষের জীবনে এনে দিতে চান স্বস্তি। ছোটবেলায় বন্ধু মুস্তাফার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন তারা সারা জীবন একসঙ্গে থাকবেন। তাই বন্ধু মুস্তাফাকে দেশে চলে আসতে বলেন তিনি। বিদেশের মাটিতে পলায়ন করে দুই বন্ধু পরাজিত না হয় দেশের মাটিতে একতাবন্ধ হয়ে দেশের জন্য কাজ করতে চান। মুস্তাফাকে ফিরে এসে নাদিয়ার কাটা পা দুটি থেকে শিক্ষা নিতে বলেন। লেখকের ধারণা নাদিয়ার কাটা পা দুটি থেকে জীবনের অস্তিত্বের মূল্য খুঁজতে গেলে যে কেউ দেশের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে চাইবে। তাই বন্ধু মুস্তাফার সঙ্গে দেশের দায়িত্ব পালন করে দেশকে মুক্ত করার আশায় তাকে দেশে ফিরে আসতে বলেন।

তাই বলা যায়, সারা জীবন অন্য দেশে গিয়ে সুখী ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশী লেখক একসময় নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে দেশকে মুক্ত করে সমস্ত দেশবাসীকে সুখী ও সুন্দর জীবন উপহার দিতে চান। এই দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশকে মুক্ত করার জন্য বন্ধু মুস্তাফাকে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে দেশে ফিরে আসতে বলেন তিনি।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০৩

ক. লেখকের কেন মনে হয়েছিল তিনি প্রথমবারের মতো পরম সত্য কথা বলেছেন? ৩

খ. 'ফিলিস্তিনের চিঠি' গল্পের মূলভাব আলোচনা কর। ৭

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বোমার আঘাতে আহত হয়ে লেখকের ভতিজি নাদিয়া গাজার হাসপাতালে ভর্তি আছে। লেখক বাড়ি পৌঁছলে তাঁর ভাবি তাঁকে জানান নাদিয়া তাঁকে দেখতে চায়। সেদিন সন্ধ্যায় এক পাউন্ড আপেল কিনে লেখক নাদিয়াকে দেখতে যান। লেখককে দেখে নাদিয়া খুশি

হয়। চাচাকে কুয়েত থেকে কখন এসেছে তা জিজ্ঞেস করে দুই হাতে ভর দিয়ে কোনোমতে উঠে বসে। লেখক তার জন্য কুয়েত থেকে কোনো উপহার না নিয়ে এলেও তার মনকে উৎফুল্ল করার জন্য অনেক কিছু বলেন। তিনি বলেন, নাদিয়া আমি তোমার জন্য কুয়েত থেকে উপহার নিয়ে এসেছি, অনেক উপহার। তুই একেবারে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার পরে সেই উপহার দেখতে পাবি। নাদিয়া যে লাল সালায়ারগুলো আনতে বলেছিল সেগুলো তিনি এনেছেন বলে জানান। লেখক কোনো উপহার না আনলেও নাদিয়াকে খুশি করতে অনর্গল মিথ্যে কথা বলেছেন। কিন্তু লেখক এমনভাবে কথাগুলো বলেছেন তাতে লেখকের কাছে মনে হয়েছে তিনি এই প্রথম কোনো পরম সত্য কথা বলেছেন। এ বিষয়টিই তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য অংশে।

খ. ফিলিস্তিনি কথাসাহিত্যিক ঘাসান কানাফানির লেখা একটি পত্রের অনুবাদ করেন মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই অনুবাদই হচ্ছে 'ফিলিস্তিনের চিঠি' গল্পটি। এ গল্পে মূলত ইসরায়েলের আক্রমণে বিপর্যস্ত ফিলিস্তিনের মর্যাদিক ও বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে।

'ফিলিস্তিনের চিঠি' গল্পে দেখা যায়, সেখানে লেখকের বন্ধু মুস্তাফাকে লিখিত একটি চিঠি তুলে ধরা হয়েছে। চিঠিতে দেখা যায়, যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিন ছেড়ে সুন্দর ও সুখী জীবনের প্রত্যাশায় লেখকের বন্ধু মুস্তাফা কুয়েতে এবং সেখান থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যান। চিঠির লেখককেও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে আমন্ত্রণ জানানো হয়। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর ফিলিস্তিন ছেড়ে অন্য যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও লেখক তা করেননি। করুণ এক অভিজ্ঞতা তাঁকে পরিবর্তন করে দেয়। তিনি ফিলিস্তিন ছাড়ার পূর্বে নিজের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এসে জানতে পারেন, তাঁর নিহত ভাইয়ের মেয়ে নাদিয়া বোমার আক্রমণে আহত হয়ে গাজার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। লেখক তাকে দেখতে যান এবং তার মনকে উৎফুল্ল রাখার জন্য তার জন্য অনেক উপহার এনেছেন বলে মিথ্যে কথা বলেন। তিনি বলেন সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরলেই নাদিয়া সেগুলো দেখতে পাবে। একথা শুনে নাদিয়ার চোখ ভিজে যায়। সাদা চাদর তুলে সে দেখায়, তার দুই পা কেটে ফেলা হয়েছে। ছোট ভাইবোনদের বাঁচাতে গিয়ে তার এই ক্ষতি হয়েছে। এই দৃশ্য লেখকের মনকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, ফিলিস্তিন ছেড়ে কোথাও যাবেন না। সেই সঙ্গে বন্ধু মুস্তাফাকেও দেশে ফিরে আসার আহ্বান করেন। 'ফিলিস্তিনের চিঠি' গল্পের শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ এবং বিপদগ্রস্ত স্বজনদের ফেলে স্বার্থপরের মতো সুখী জীবনের জন্য অন্য দেশে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোনো মহত্ত্ব নেই। বিপদের সময় দেশ ও স্বজনদের সঙ্গে থেকে বিদ্যমান সংকটকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করলেই মানুষের মানবিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পটির ভেতরে এ বিষয়টিও উঠে এসেছে যে, দেশ ও স্বজনদের বিপদে পাশে দাঁড়ানোই মানুষের প্রকৃত দায়িত্ব।

